Vignettes

“তারাপুর গাজিপুর পার হয়ে চলেছি পায়রাডাঙার দিকে। ধূলিধূসরিত রাস্তা। দূরে আমবাগান। যাচ্ছি তিন জন, ভ্যান রিকশার পিঠে বসে। হাওয়ায় ভেসে এল হঠাৎ চেনা কবিতার লাইন। কবিতার লাইন? এখানে? আর খুব পুরোনো কালের লেখাও নয়। একেবারে সাম্প্রতিক কবিতা। কার গলা?

ইতিমধ্যে ঢালুতে উঠেছে ভ্যানগাড়ি। আমরা নেমে আগে আগে উঠে পড়েছি বড় বাস রাস্তায়। তার পাশে বাঁশের বেঞ্চি বসানো চায়ের দোকান। বয়ামে কেক। নোনতা বিস্কুট। সামনেই উনুনে হাওয়া দিচ্ছে চা দোকানের যুবক। আমাদের বিস্ময় লক্ষ্য করে জবাব দিল। জানেন না, ব্রততীদির গলা! ওই তো পচার দোকানে ক্যাসেট বাজছে। ধুলো উড়িয়ে চলে গেল বাস।

পচার দোকান? ‘মাইক ভাড়া দেওয়া হয়’। ‘সজল ক্যাটারার’। লেখা আছে বটে। সেখানেই বড় সাউন্ড বক্স থেকে বেরিয়ে আসছে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ। সেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা – না পাঠানো চিঠি।

চায়ের দোকানের ছেলেটি বলে, উনি তো এসেছিলেন এখানে, দারুণ প্রোগ্রাম করেছেন। চায়ের গেলাস হাতে আমরা বসে আছি বেঞ্চে। এই কবিতা শেষ হয়ে অন্য কবিতা শুরু হল। আমাদের ভ্যান রিকশার চালক যে, সেও সিটের উপর বসে শুনছে। বুঝুক না বুঝুক শুনছে চুপ করে। চা-দোকানের যুবক বলে, বাড়িতেও তো আমরা ওনার ক্যাসেট বাজাই। ব্রততী এটা পেরেছেন। শহরের মানুষের কাছে তাঁর পাঠ কবিতাকে পৌঁছে দিয়েছে। মানুষের আগ্রহ বাড়িয়েছে কবিতার প্রতি। আবার

দূর গ্রাম বা গঞ্জ শহরেও আমি নিজে দেখে এসেছি তিনি পৌঁছে গেছেন তাঁর স্বর নিয়ে।” - জয় গোস্বামী।

“২৬শে জুন আসার আগে থাকতেই আমার ব্রততীর কথা মনে পড়তে থাকে। কারণ ওটা ব্রততীর জন্মদিন। ব্রততী যখন ব্রততী হয়নি তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আলাপ এবং বন্ধুত্বও। তখন থেকেই ওকে আমি স্নেহ করতাম।

ওদের বাড়ি ছিল হৃদয়পুর। হৃদয়পুরে ওদের সেই বাগানবাড়িতে অনেকবার গিয়েছি, এমনকি পিকনিকও করেছি। ওরকম একটি পিকনিকে এক শীতের দুপুরে প্রয়াত আবৃত্তিকার প্রাণবন্ত নীলাদ্রিশেখরের নাচ কোনোদিন ভোলা যাবে না। সহাস্য দর্শক ছিলাম আমি, পার্থদা, গৌরীদি, অমিতাভ এবং কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যতদূর মনে পড়ছে নীলাদ্রিশেখরের সঙ্গে পা মিলিয়ে ছিল উর্মিমালা। সে এক হইহই রইরই কাণ্ড।

ব্রততী বেথুনে পড়ত। অর্থনীতির ছাত্রী। আর সঙ্গে চলত আবৃত্তির অনুশীলন আর সাফল্যের জন্য খিদে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রততী আমাদের আকাশবাণীর নাট্যবিভাগে এল। কী প্রবল উৎসাহ তখন তার। রেকর্ডিং না থাকলেও চলে আসত আকাশবাণীতে। আবদার করত, ‘কলেজ থেকে এসেছি। খিদে পেয়েছে – ডিমের ঝোল ভাত খাব?’ আমি ওকে নিয়ে ক্যান্টিনে ছুটতাম। কখনও সখনও ময়দানের পুলিশ টেন্ট-এ গিয়ে দারুণ স্বাদু মেটের ঝোল খাইয়েছি। তারপর ও বি.এ. পাশ করল। মাঝে উল্টোডাঙায় থাকত। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতেও আসত। ও আর ওর কলেজের বন্ধু রাতুলা। রেডিওর নাটকে সে সময় রোমান্টিক চরিত্রে লোকে আমায় খুব পছন্দ করত। ব্রততী, রাতুলারা তখন আমার কণ্ঠস্বরের খুব ভক্ত।

আকাশবাণীর নাট্যবিভাগে এবং দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগে ব্রততীর যাতায়াতে আমার যে একটা পরোক্ষ প্রেরণা ছিল একথা ভাবলে এখন আমার ভালোই লাগে। তারপর থেকে ওকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। তারপর শুধুই ব্রততীর এগিয়ে চলার ইতিহাস।" - জগন্নাথ বসু।

"ব্রততীর সাথে ভাব জমে উঠতে দেরী হয়নি। ক্রমশঃ যত ওকে কাছ থেকে দেখেছি, ততই অবাক হয়েছি। কি অসম্ভব মনের জোর, কঠিন পরিশ্রম, আর অমানুষিক জেদ নিয়ে ধীরে ধীরে খ্যাতির শীর্ষে উঠে এসেছে মেয়েটা একেবারে একা। সম্বল ছিল শুধুই ওর কবিতা – যেটা ওর প্রথম, শেষ – হয়তো চিরন্তন প্রেমের জায়গা। আর আমার সঙ্গে ওর মনের এত মিল হওয়ার তিনটে প্রধান সূত্র ছিল – শাড়ী, খাওয়া আর বেড়ানো। আমার ছোট্ট গাড়িটা চালিয়ে দুজনে মিলে যে কত exhibition আর restaurant চষে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আর কলকাতার বাইরে দূরে কোন অনুষ্ঠানে আমি আর ব্রততী থাকলেই, আর কথা নেই! ট্রেন থেকে সেই যে আড্ডা শুরু করেছি। সেটা থেমেছে আবার বাড়ির সামনে এসে। কোথাও দেখা হলেই আগে দুজনে দুজনের সাজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করেছি, আর এটা বলাই বাহ্য, যে প্রতিবারই ও আমাকে ফেল করিয়ে দিয়েছে। আমার কাছে ওর আবদারেরও শেষ নেই – "ও ইন্দ্রাণীদি, সেই যে পরশু একটা হার পরেছিলে, কি দারুণ! আমাকে একটা আনিয়ে দেবে?" "আচ্ছা! তোমরা তো অনেকদিন খিচুড়ি খেতে ডাকছ না? এবার অরূপদার কাছ থেকেই নেমন্তন্ন চাইতে হবে দেখছি!" – "আমার নতুন flatটা কেমন সাজিয়েছি, একবার দেখতে আসবে না?" – এই হল ব্রততী – একটা নির্ভেজাল, সাদাসিধে, ঘরোয়া মেয়ে – এক্কেবারে আমার মনের মতন।" - ইন্দ্রাণী সেন।

“আপনারা সবাই আবৃত্তিশিল্পী ব্রততীকে চেনেন। আমি আপনাদের পরিচয় করাব অন্য এক শিল্পী ব্রততীর। দুহাজার পাঁচের লক্ষ্মীপুজোর রাত – মুসৌরী পাহাড়ে। চরাচরে বিস্তৃত চন্দ্রালোক, নীচের মুসৌরী শহরে মনে হচ্ছে অভ্রকুচী ছড়ানো।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙলো ব্রততীদির ডাকে। “এক্ষুনি ওঠ্ নয়তো মিস্ করবি। কাঁচের দেওয়ালের ওপারে প্রবল ঝড়, পাহাড়ে গাছপালার আলোড়ন – কাঁপছে স্টার্লিং রিসর্ট হোটেল। কোটি ওয়াটের বিদ্যুৎ ঝলকানি দৃশ্যমান করছে মুসৌরী পাহাড়কে। সঙ্গে শিলাবৃষ্টি।

ঠিক তখনই ব্রততীদির উচ্চারণ:

“ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে...
বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা?”

আমি নির্বাক – স্থাণুবৎ।

ঝড় থামল একসময়। বৃষ্টি চলতেই থাকল – ঘুমোবার আগে বলল, ‘এই ভয়ঙ্কর সুন্দরকে উপভোগ করতে পারার জন্য কালকে হবে সেলিব্রেশন”। সকালে উঠেই ঘোষণা – “আজ হোটেলের খাবার বন্ধ করে নিজেরা রাঁধব লাগোয়া কিচেনেটে। দুপুরে খিচুড়ি ওমলেট রাঁধবি তুই, রাতে আমি চিকেন বানাবো – Bratati’s Special।” অবাক আমি – “তুমি রাঁধবে?” “কেন পারবনা ভাবছিস? যদিও প্রায় আটবছর কিচেনে ঢুকি না।” তবু বললাম, “এত power cut – hot plate তো hot রাখাই মুস্কিল। আর চাল ডাল পাওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় মশলাপাতি কোথায় পাবো?” মুহূর্তে উত্তর – “হৃদয়ের ‘উত্তাপ’ আর ইচ্ছে ‘মশলা’ থাকলেই সব কিছুই সম্ভব।” রাতেই অবশ্য তার প্রমাণ পেলাম।

বিকেল থেকেই শুরু হল অবিশ্রাম বর্ষণ। তারই মধ্যে আমার স্বামী সুভাষ কিনে নিয়ে এল পাহাড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে মুরগী। প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই পাওয়া গেল না। যেমন – হলুদ, তেল ইত্যাদি। অদম্য ব্রততীদি সঙ্কল্পে অটল। বলল, 'কুছ পরোয়া নেই – যা পাওয়া গেছে তাই দিয়েই হবে।' আমার ছেলে ছোট ঋক তাঁর এ্যাসিসট্যান্ট। অনতিদূরে বসে দেখছি অন্য ব্রততীদিকে। কাটার অযোগ্য ভোঁতা ছুরিতে বিরক্ত না হয়ে হাত দিয়ে পেঁয়াজ ছাড়িয়ে চালিয়ে দিচ্ছে রান্নার কাজ। কোন অসন্তোষ নেই।

সত্যিই হৃদয়ের উত্তাপেই হয়তো একসময় প্রস্তুত 'Bratati's Chicken'। সঙ্গে পাঁউরুটি আর দুপুরের লেফটওভার খিচুড়ী।

চেনেন কি এই ব্রততীকে? রান্না খেয়ে আমরা অভিভূত। প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছি। প্রশংসাটুকু গায়ে মেখে উত্তর দিল, "যখন যে কাজটা করবি তার পেছনে যদি প্যাশন আর ভালোলাগা কাজ করে সফল হবিই।" - বুলা বাগচী।

"খড়দহ রবীন্দ্রভবন উদ্বোধনের দিন দ্বিতীয়ার্ধে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় আড়াই ঘন্টার একটি অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার এক সহকর্মী, যে কোনোদিন এর আগে কোনো আবৃত্তির অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার এক সহকর্মী, যে কোনোদিন এর আগে কোনো আবৃত্তির অনুষ্ঠানে যায়নি, স্বাভাবিক ভাবেই অনুষ্ঠানে আসার আগে বলেছিলেন যে আধঘন্টা থেকে আটটার ভেতর চলে যাবেন। কারণ, ওর বাড়ী দূরে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম মিঃ চ্যাটার্জী শুধু নিজেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন না, মোবাইল অন করে তার আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীকেও শোনাচ্ছেন, এ যেন গুপী গাইনের ম্যাজিক! যে আবৃত্তির আ বোঝেনা, সে শুধু

আটকেই যায়নি, আমি ওর দেরী হচ্ছে বলে স্মরণ করাতে আমাকে বললো, দরকার হলে সারারাত রাস্তায় থাকবে কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ না করে উঠবে না। অনুষ্ঠান শেষ হল রাত পৌনে দশটায়। মিঃ চ্যাটার্জী আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন আমি আজ ওর জীবনের একটি অন্যতম স্মরণীয় সন্ধ্যা উপহার দিলাম। বলিউডের কোন মেগাস্টারকে দেখতে যেমন ভিড় হয়, সেদিন তার থেকেও বেশি ভিড় হয়েছিল রবীন্দ্রভবনের ভেতরে ও বাইরে ব্রততীর কবিতা শুনতে। রাত দশটাতেও রবীন্দ্রভবনের বাইরের জায়ান্ট স্ক্রীনের সামনে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে ব্রততীকে একটি বার দেখবে বলে। সেদিন অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীর অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে আলাপ হয় দিল্লী নিবাসী চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি অবাঙালী ছেলের সঙ্গে। পেশায় এঞ্জিনিয়ার ছেলেটি আর কয়েকজন অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে খড়দহ রবীন্দ্রভবনের Sound system installation-এর দায়িত্বে ছিল। ওরা সবাই অনুষ্ঠানের পর, শিল্পীর কাছে sound effect সম্পর্কে খোঁজখবর করছিল। জানলাম, সেবার ছেলেটি প্রথম কলকাতায় এসেছে এবং একটু আধটু বাংলা বোঝে কিন্তু আবৃত্তি কেমন লাগল জিজ্ঞেস করাতে দেখলাম ছেলেটির চোখে-মুখে বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস। ও শুধু বললো 'I am spellbound! I just don't know how I can express my feelings!' সত্যিকারের শিল্প, আমার মনে হয়, এভাবেই দেশ-কাল ও ভাষার গণ্ডি অনায়াসে অতিক্রম করে আর এখানেই ঘটে শিল্পীর সার্থক উত্তরণ। - সুমন্ত রায়।

"ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অপহৃত বিমান IC-814-এ জঙ্গীদের কবল থেকে যাত্রীরা উদ্ধার পাবে কিনা তাই নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে। এই সময় একদিন নজরুল মঞ্চে মিলেনিয়্যাম কনসার্টে গিয়েছি। বিশিষ্ট গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। মান্না দে সহ প্রথিতযশা গায়করা গান গাইবেন। প্রত্যেকের বরাদ্দ দুটো করে গান। আমাকেও দুটো কবিতা বলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মান্না দে চারটে গান গাইলেন। দর্শক আসন থেকে দাবী উঠল মান্না দে কে আরও গান গাইতে দিতে হবে। দর্শকদের দাবী ক্রমে উত্তেজনার রূপ নিল। সংযোজকের দায়িত্বে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। বারংবার তিনি বললেন মান্না দে'র শরীর অসুস্থ তিনি আর গাইতে পারবেন না। দর্শকরা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। বরং তাদের প্রতিবাদের সুর আরও চড়া হল। তারা বলতে লাগলেন মান্না দে'কে গান গাইতে না দিয়ে অপমান করা হচ্ছে। মান্না দে ছাড়া আর কারও গান তারা শুনবেন না এও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন। পরিস্থিতি যখন প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এক দর্শকাসন থেকে অন্য দর্শকাসনে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। আয়োজকরা আমাকে অনুরোধ করলেন মঞ্চে গিয়ে কবিতা পড়ার জন্য। মুহূর্তেই ঠিক করে নিলাম রবীন্দ্রনাথের 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটা বলবো। চতুর্দিক ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ, অথচ যাত্রীদের দুর্গম পরিস্থিতি তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে সত্যের লক্ষ্যে। শুরুতেই বললাম কান্দাহার বিমানবন্দরে জঙ্গিদের হাতে আটক যাত্রীদের দুঃসহ অবস্থার কথা। বললাম দর্শকাসনের এই সমবেত রোষ যদি আজ ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারতো বিপন্ন যাত্রীদের জঙ্গীদের কবল থেকে। দেখলাম মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেলেন প্রতিবাদী দর্শকরা। আমি বললাম 'ঝড়ের খেয়া'।"

- ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আবৃত্তিচর্চার দিনলিপি'।

"একবার বিশাখাপত্তমে এক অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম। সেখানে বেশীরভাগ শ্রোতাই তেলুগুভাষী। কিন্তু আমি কবিতা পড়ব বাংলা ভাষায়। সাফল্য নিয়ে প্রথম

থেকেই একটা সংশয়ের মধ্যে ছিলাম। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক যারা এসেছিলেন তাদের কেউই বাংলাভাষী নন।

ঔপনিষদিক স্তোত্র উচ্চারণের পর শুরু করলাম আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, শুভ দাশগুপ্ত এঁদের সবার কবিতা গলায় উঠে এল একে একে। কবিতা পড়া শেষ করে দেখি এ যেন আমার পরিচিত পশ্চিমবাংলা। সবাই এগিয়ে আসছেন, তাদের ভাল লাগার কথা জানাচ্ছেন। কেউ কেউ নিজেরা কবিতাগুলো ঠিক বুঝেছেন কিনা আমার কাছে তা পরিষ্কার করে নিতে চান। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কই আমার চাওয়ার সঙ্গে আমার পাওয়ার তো কোন প্রভেদ দেখছি না। এবার নতুন করে মনে হল ভাষা কোন প্রতিবন্ধক নয়।”

- ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘আবৃত্তিচর্চার দিনলিপি’।

“একবার একটা ঘটনা ঘটল। আমি এটাকে ঘটনাই বলব। দিল্লীতে আমার এক অনুষ্ঠানে ব্যঙ্ক অব আমেরিকার দুই কর্তাব্যক্তি সস্ত্রীক এসেছেন। আমি সবেমাত্র হলে ঢুকেছি। মুখোমুখি হলাম তাদের। ভদ্রলোকদের একজন আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আমাদের স্ত্রীরা আপনার খুব ভক্ত, ওদের মুখে আপনার কথা প্রায়ই শুনি, পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে। আমরা এসেছি কেবলমাত্র ওদের পৌঁছে দিতে, সাংঘাতিক কর্মব্যস্ত বাঙালী বুঝছেন না! আমাদের এক্ষুনি চলে যেতে হবে। আপনার অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হবে না।

তাদের কথা আমার আর মনে ছিল না। ঘন্টা খানেক পর অনুষ্ঠান শেষে যখন হল থেকে বেরোচ্ছি তখন মুখোমুখি হলাম তাদের। এবার যা ঘটল আমি কল্পনাও

করতে পারিনি। সেই ভদ্রলোক যিনি বলেছিলেন এক্ষুনি চলে যেতে হবে, এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। কি হল? এই ভদ্রলোক কি এতক্ষণ ধরে কবিতা শুনেছেন? কেমন একটা খটকা লাগল। "আমি যে আবার নিজেকে ফিরে পেলাম" – এই বলে তার সে কী কান্না! আমি নিতান্তই অপ্রস্তুত। অপ্রস্তুত তার স্ত্রীও। এও কী বিশ্বাস করা যায়। কবিতায় কী তাহলে এতটাই শক্তি যে মানুষকে কাঁদাতে পারে।"

- ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আবৃত্তিচর্চার দিনলিপি'।

"আমি মনে করি আবৃত্তির 'নির্বাচিত শ্রোতা' বলে কিছু নেই। জলপাইগুড়ির পুলিশ লাইন্সে কবিতা পড়েছি, পনেরো হাজার মানুষ ভীড় করে কবিতা শুনেছে।

দিল্লীতে একবার অনুষ্ঠানের পর সত্তরোর্ধ এক বৃদ্ধ আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, চারিদিকে যে সামাজিক আর নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চোখের সামনে দেখছি মা তাতে জীবনে আর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজ তোমার কবিতা শুনে মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন আমায় বাঁচতে হবে মা, অন্ততঃ তোমার কবিতা আবার শোনার জন্য।

যখন কোন সুদূর গ্রামগঞ্জে যাই শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ কবিতা শুনতে ভিড় করেন। কবিতা শুনে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের কেউ এগিয়ে এসে আমায় আশীর্বাদ করছেন সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। আবৃত্তি যে এখন কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ক্যাসেট বিক্রির পরিসংখ্যান থেকেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারি। চিঠি পাই আমার ক্যাসেট 'আমিই সেই মেয়ে – প্রথম পর্ব' মেদিনীপুরের চাষীর ঘরে বাজছে। সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘না পাঠানো চিঠি’ কবিতাটি ‘আমিই সেই মেয়ে – দ্বিতীয় পর্ব’-এর ক্যাসেটে রয়েছে।

টাকার জন্য এক বাবা তার মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কলকাতার এক পতিতালয়ে সেই মেয়ে ক্লেদাক্ত জীবনযন্ত্রণা ভোগ করছে। সেখানে থেকে সে তার মাকে চিঠি লিখছে। সে জানে না যে সে চিঠি কোনদিন তার মার হাতে পৌঁছবে কিনা, তবুও সে লিখছে:

‘আমি তোমার মেয়ে নই,

কিন্তু তুমি আমার মা।

তোমার আরো ছেলে মেয়ে আছে

কিন্তু আমি মা পাব কোথায়?’

এই কবিতা শুনে পতিতাপল্লী থেকে কেউ একজন আমায় ফোন করে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো। বলল দিদি, আমি যে এর মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। সত্যিই কি আমাদের এই যন্ত্রণার কোনো শেষ নেই। আপনিই বলতে পারেন এর শেষ কোথায়।

হায়! তা যদি সত্যিই সম্ভব হত!”

- ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘আবৃত্তিচর্চার দিনলিপি’।